আজকের কাগজ

তারিখ ... 22.SEP 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

সাক্ষরতা-শিক্ষা-উন্নয়ন

মীর মাসরুর জামান

সাক্ষরতার মানে কি শুধু অক্ষরজ্ঞান? শুধু বর্ণমালা চিনতে পারা? শুধু অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে শব্দ তৈরি করতে জানা? না। সাক্ষরতা যদি হয় শিক্ষার অংশ কিংবা সাক্ষরতার লক্ষ্য যদি হয় শিক্ষা অর্জন, তাহলে সাক্ষরতার অর্থ নিশ্চয়ই এমন দাঁড়াবে। তাহলে সাক্ষর মানুষ হবে শিক্ষিত মানুষ। প্রকৃতঅর্থে শিক্ষিত মানুষ মানে সচেতন মানুষ। যে মানুষের চোখ কালো অক্ষরে বন্দি শব্দাবলীতে আলো জ্বালতে পারে, যে মানুষ তার আলোকিত চোখে আবিষ্কার ও অনুভব করতে পারে সামাজিক মানুষ হিসেবে তার সুদৃঢ় অস্তিত্ব, সুস্থ বোধ, দায়বদ্ধতা, অধিকার আর অধিকার অর্জনের পথ। তাই, সাক্ষরতার মানে শুধু লিখতে পড়তে জানা নয়। লিখিতভাবে হিসাব-নিকাশ করার যোগ্যতা নয়। নিজের দেশ, সমাজ ও পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানও সাক্ষরতার সঙ্গে যুক্ত, যা সার্বিকভাবে মানব সম্পদ উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান এবং সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার।

কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী শীর্ষক প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছিলো, 'আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীদের চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্যে শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভ সুযোগ সুবিধার সমতা বিধান দ্বারা জাতীয় প্রতিভার সদব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষার সর্বস্তরে জাতীয় চার মূলনীতি (জাতীয়তাবাদ, ধর্ম নিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র)-এর সার্থক প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে।'

অর্থাৎ শিক্ষায় সমন্বিত থাকে, মানুষের অক্ষরজ্ঞান, কর্মদক্ষতা, উৎপাদন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রবণতা, জাতীয়তাবাদী চেতনা, নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা ও জ্ঞান, সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন এবং নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সুস্থবোধ ও চেতনার বিষয়সমূহ। এ ছাড়া শিক্ষা কার্যকরী ও অর্থবহ হয় না। এবার আমাদের দেশের সাক্ষরতা কিংবা শিক্ষার অবস্থাটি আলোচনা করা যাক।

আমাদের মতো দেশে অধিকার বঞ্চিত মানুষেরা অন্যতম প্রধান মৌলিক অধিকার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ব্যাপকভাবে। এখানে সাক্ষরতার নামে যা শেখানো হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে তা অক্ষরজ্ঞানও নয়। দেখে দেখে কিংবা হাত ঘুরিয়ে নিজের নামের আক্ষরিত রূপটি আঁকতে শেখা কিংবা কোনো রকমে কিছুটা পড়াতে পারা, কিছুটা যোগ-বিয়োগ করতে পারা ব্যাস। এ থেকেই হিসাব করা হয় শিক্ষিতের হার। এমন হিসাবেও স্বাধীনতার ২৫ বছরে এ দেশে শিক্ষার হার বেড়েছে কারো মতে ২৫, কারো মতে ৩০ ভাগ। প্রাথমিক শিক্ষা সবার জন্যে বাধ্যতামূলক। কিন্তু এতে মূলত দারিদ্রসীমার নিচের মানুষ শিক্ষালাভের সুযোগ পাচ্ছে না। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে অনেক স্কুল তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু তারপরও ৬৮ হাজার গ্রামের মধ্যে ৩০ হাজার গ্রামে একটিও স্কুল নেই। বাংলাদেশে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত ৩৭৭০৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিলো যার মধ্যে ৩১০০০ মাত্র গ্রামে। গড়ে তিনটি গ্রামের জন্যে একটি স্কুল। আবার সরকারি স্কুলগুলোর শিক্ষার হার পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তা আগের চেয়ে কমে এসেছে। যেমন- ১৯৮৫ সালে ৮৯ শতাংশ ছাত্রছাত্রী সরকারি বিদ্যালয়ে ছিলো, সেখানে ১৯৯৪ সালে সেই সংখ্যা ৭৪ শতাংশে নেমে এসেছে। বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রী অধ্যায়নের হার অত্যন্ত কম। তার ওপর আবার যতো জন ভর্তি হয় তা থেকে বেশিরভাগই সরে পড়ে। স্কুলগুলোতে বই পুস্তক বেঞ্চের অভাব ও অন্যান্য সমস্যা তো আছেই। ১৯৯৪-৯৫ অর্থবছরে উন্নয়ন খাতে ব্যয়ের হার ছিলো ৫৭৮ কোটি টাকারও বেশি। তবে রাজস্ব ব্যয়ের ৮৮ শতাংশ শিক্ষকের বেতন ও সুযোগ-সুবিধার জন্যে ব্যয় হয়। ফলে অন্যান্য ব্যয়ভার মেটানোর জন্যে যে অর্থ থাকে তা কার্যকরী হতে পারছে না আশাব্যঞ্জকভাবে। তার ওপর শহর ও গ্রামের ছিন্নমূল শিশুরা প্রতি মুহূর্তে ব্যস্ত থাকে খেটে বা কুড়িয়ে ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে। এ অবস্থায় শুধু স্কুল বানানো হলেই কি তাদের পক্ষে সম্ভব খালি পেটে সেখানে গিয়ে বর্ণমালা মুখস্ত করা? এছাড়া কিন্ডার গার্টেন, ক্যাডেট কলেজ, মাদ্রাসা এবং বেসরকারি ব্যয়বহুল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই বৈষম্যমূলক অবস্থাকে আরো প্রকট করেছে। এ সব তো গেলো দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং তার মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের আয়োজনের ত্রুটি বিচ্যুতি ও অকার্যকারিতার কিছু সামান্য দৃষ্টান্ত।

এবার দেশের শিক্ষা কার্যক্রমের নীতি, উদ্দেশ্য ও এসবের সারবস্তুর দিকে আলোকপাত করা যাক। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, জাতীয় শিক্ষানীতি বলতে এদেশে আজো কিছু নেই। শিক্ষা ব্যবস্থা বলতে যা আছে তাও এতো দুর্বল ও নড়বড়ে যে, একে বিধ্বস্ত কিংবা মুমূর্ষু বলা চলে। স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে সার্বিক অর্থে এর অবনতিই ঘটেছে। এই পর্যন্ত দেশে তিন ধরনের শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে- ১৯৭২ সালে কুদরত-ই-খুদা কমিশন, ১৯৭৮ সালের কাজী জাফর কমিশন এবং ১৯৮২ সালের মজিদ খানের শিক্ষানীতি।

বঙ্গবন্ধুর আমলে কুদরত-ই-খুদা কমিশনের রিপোর্টে মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলদেশের সংবিধানের জাতীয় চার মূলনীতির ওপর জোর দেয়া হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে এর প্রতিফলনের কথা বলা হয়। আর এসবের ভিত্তিতে যে সুপারিশমালা প্রণয়ন করা হয় তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, শিক্ষা ক্ষেত্রে শ্রেণী বৈষম্য সৃষ্টিকারী বিদ্যালয়সমূহের বিলোপসাধন করা প্রয়োজন। আরো বলা হয়েছে, শিক্ষাকে ব্যয়বহুল সমাজ সেবামূলক কর্ম হিসেবে নয়, সম্পদ সৃষ্টির উপায় হিসেবে গণ্য করতে হবে। জিয়া সরকারের আমলে কাজী জাফর কমিশনের রিপোর্টে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আলোচনায় জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গটি সচেতনভাবে বর্জন করা হয়েছে। এখান থেকে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তার প্রভাবের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যেতে শুরু করে। এ রিপোর্টে প্রাথমিক স্তরের অভিন্ন পাঠ্যসূচির সুপারিশ ব্যক্ত হলেও এই সরকারের আমলেই কিন্ডার গার্টেনসহ বৈষম্য সৃষ্টিকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি পেয়েছে, বিকশিত হয়েছে। অভিন্ন পাঠ্যসূচির পরিবর্তে ভিন্ন ভিন্নমানের ইংরেজি ও আরবী পাঠ্যক্রম অনুসৃত হয়েছে। এ সবের ফলে শ্রেণী বৈষম্যের ভিত অধিকতর মজবুত হয়েছে।

তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সবার জন্যে শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার জন্যে গণমাধ্যমগুলোর উচিত আরো গবেষণালব্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করা। প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে টেলিভিশনের একটি বিশেষ চ্যানেল চালু করার কথা ভাবা যেতে পারে। তবে এসব কিছুর আগে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষার নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যাতে থাকবে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিফলন, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার প্রভাব।

এরশাদ আমলের মজিদ খান শিক্ষানীতিতে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতির বিন্দুমাত্র উল্লেখ কোথাও নেই। ফলে এর ভিত্তিতে শ্রেণী বৈষম্য, প্রতিক্রিয়াশীলতা ইত্যাদি শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রশ্রয় পেয়েছে। এভাবে দিনের পর দিন শিক্ষা ক্ষেত্র সাধারণের জীবন ও জীবনবোধ এবং প্রগতিশীল জাতীয় চেতনা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

অন্যদিকে জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রায় সবকটি দেশই মহাআড়ম্বরের সাথে শিক্ষার ওপর ব্যাপক গুরুত্ব দেয়ার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। ১৯৬৭ সাল থেকে প্রায়-প্রতি বছর ৮ সেপ্টেম্বর পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। বিশ্বজুড়ে, দেশ জুড়ে আরো কতো কর্মসূচি। আমাদের দেশের বাজেটে প্রতিবছরই শিক্ষাখাতে সর্বাধিক বরাদ্দের কথা বলা হয় উচ্চস্বরে। এতো সব কিছুর পরও সাক্ষরতার হার, শিক্ষিতের সংখ্যা এখানে বাড়ছে না। বরং মানুষের শিক্ষার অধিকার পরিণত হচ্ছে সুযোগে এবং তা বন্টনে প্রকটতর হচ্ছে বৈষম্য। প্রতিটি দেশের সরকারই উন্নয়নের কথা বলেন। আমাদের দেশেও তাই এবং আমাদের দেশে শুধু তাই নয় সরকারি বক্তব্যে উন্নয়ন শব্দটির সাথে যুক্ত হয়েছে জোয়ার। চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ ছাড়া, অমাবস্যা পূর্ণিমার সঙ্গে সম্পর্কহীন এই জোয়ারে প্রতি মুহূর্তে প্লাবিত হচ্ছে সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন। কিন্তু এই জোয়ারে ভেসে মানুষের কাছে যা আসছে, তার মধ্যে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান উপাদান শিক্ষার বিস্তার কি আছে? না, নেই। কোনো কার্যকররূপে তা নেই। তাহলে প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন কি হচ্ছে? তা হচ্ছে না। শিক্ষার কার্যকর বিস্তার ছাড়া উন্নয়ন কখনোই সম্ভব নয়। উন্নত কৃষি প্রযুক্তির বিস্তার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি, জনসাধারণের যথোপযুক্ত পুষ্টি ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা যে কোনো বিষয়ই বিবেচনায় নেয়া যাক না কোনো এসবের জন্যে সর্বস্তরে শিক্ষার প্রসার একটি অন্যতম প্রাথমিক শর্ত।

অতএব, দেশের সর্বস্তরে সাক্ষরতার প্রকৃত বিস্তার ঘটানো, সাক্ষরতাকে শিক্ষায় রূপ দেয়া এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্যে কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ দায়িত্ব সরকার, দেশের রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনসমূহ থেকে শুরু করে দায়িত্বশীল ও সচেতন সবার।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের দেশে সাক্ষরতা লাভ করাই রীতিমতো জটিল এবং দুঃসাধ্য। এই অবস্থায় অর্জিত সাক্ষরতাকে কিভাবে কোন পন্থায়

আজকের কাগজ

তারিখ ... 22 SEP-1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৩ ......

ধরে রাখা যাবে এবং তাকে কাজে লাগানো যাবে এ বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে। তাই সাক্ষরতাকে শিক্ষায় রূপ দেয়ার জন্যে বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিৎ। এ পর্যায়ে নারী সমাজকে সম্মানজনক বিবেচনায় আনতে হবে। বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহের গ্রামভিত্তিক কর্মকাণ্ডের ধরনটিকে সরকারি পর্যায়েও অনুসরণ করা যেতে পারে। এ ধরনের কর্মকাণ্ডকে আরো ফলপ্রসূ ও কার্যকর করার জন্যে সরকারসহ সবাই মিলে সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত।

তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সবার জন্যে শিক্ষা পৌঁছে দেয়ার জন্যে গণমাধ্যমগুলোর উচিত আরো গবেষণালব্ধ কার্যক্রম গ্রহণ করা। প্রয়োজনবোধে এ ব্যাপারে টেলিভিশনের একটি বিশেষ চ্যানেল চালু করার কথা ভাবা যেতে পারে। তবে এসব কিছুর আগে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষার নীতি, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যাতে থাকবে আবহমান বাঙালি সংস্কৃতির প্রতিফলন, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার প্রভাব।

তাহলে শিক্ষার বিস্তার যেমন কার্যকর হবে তেমনিভাবে সামাজিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূর হয়ে সার্বিক প্রগতিও ত্বরান্বিত হবে। এ প্রসঙ্গে ১৯৯০ সালে থাইল্যান্ডের জমতিয়েনে অনুষ্ঠিত বিশ্ব শিক্ষা সম্মেলনের ঘোষণাটি স্মরণ করা যেতে পারে। সেই ঘোষণার কয়েকটি জায়গায় বলা হয়েছে, সকলের জন্যে মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রচলিত মৌলিক শিক্ষার প্রতি সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করাই যথেষ্ট নয়, বিদ্যমান সর্বোত্তম ব্যবস্থাদির ভিত্তিতে দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে হবে যেনো বর্তমান সম্পদসীমা, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, শিক্ষাক্রম এবং শিক্ষাদান পদ্ধতি অতিক্রম করে সকলের মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণ করা যায়।

শিক্ষার সম্প্রসারিত সুযোগ কোনো ব্যক্তি বা সমাজের অর্থবহ উন্নয়নের কাজে লাগে কিনা তা চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে প্রাপ্ত সুযোগ থেকে ঐ ব্যক্তি বা সমাজ প্রকৃতপক্ষে কোনো শিক্ষা অর্জন করে কি না তার ওপর। অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত প্রয়োজনীয় জ্ঞান, যুক্তি, যোগ্যতা, দক্ষতা এবং মূল্যবোধ যদি আত্মীকরণ করা যায় তবেই শিক্ষা উন্নয়নের কাজে লাগে।

শিশু, যুবা বয়স্ক সকলের প্রয়োজনের বৈচিত্র্য, জটিলতা এবং পরিবর্তনশীলতার কারণে মৌলিক শিক্ষার সংজ্ঞায় নতুন নতুন মাত্রা যুক্ত হয়ে এর পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। যেমন- নবজাতকের যত্ন ও শিশুর প্রারম্ভিক শিক্ষা ঃ প্রাথমিক শিক্ষা; যুবা ও বয়স্কদের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী নানামুখী শিক্ষা; তথ্য বিনিময়ের কৌশল ও মাধ্যম ব্যবহার করে জনগণকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানদান এবং সামাজিক সমস্যাবলী সম্বন্ধে অবহিত করা এবং শিক্ষিত করা।

সমাজ বিচ্ছিন্ন হয়ে শিক্ষালাভ হয় না। যাদের জন্যে শিক্ষার আয়োজন তারা যেনো শিক্ষা কর্মকাণ্ডে শরিক হওয়ার জন্যে এবং সে কর্মকাণ্ড থেকে উপকৃত হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় পুষ্টি, স্বাস্থ্য, সেবা, শারীরিক ও আবেগিক সমর্থন পেতে পারে সামাজকে তা নিশ্চিত করতে হবে।

ব্যক্তি ও সমাজের উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা এবং তার সদব্যবহার করার জন্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমর্থক নীতিমালা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

অতীতের চেয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিস্তৃততর আকারে সকলের জন্যে মৌলিক শিক্ষা আয়োজন করতে গেলে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সরকারি বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী কর্মকাণ্ডে অধিকতর অর্থসম্পদ ও মানব সম্পদ যোগানো অপরিহার্য

মৌলিক শিক্ষার প্রয়োজন মেটানো সকলের ও বিশ্বের মানবিক দায়িত্ব। সে কারণে বিদ্যমান অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতিকারকল্পে ন্যায্য, নিরপেক্ষ অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দৃঢ় করা প্রয়োজন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলদেশের সংবিধানের ১৭ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, রাষ্ট্র-

(ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্যে;

(খ) সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্যে এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্যে;

(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এই সাংবিধানিক অঙ্গীকারের ২৩ বছর পরও আজ পর্যন্ত এর ইতিবাচক বাস্তবায়ন ঘটেনি। অর্থাৎ, রাষ্ট্র হয়ে পড়েছে গণবিচ্ছিন্ন, সমাজ বিচ্ছিন্ন। তাই শিক্ষা কার্যক্রমের বেলায়ও ঘোষণা ও কর্মকাণ্ডের, কর্মসূচি ও বাস্তবায়নের মধ্যে সূচিত হচ্ছে বিশাল ব্যবধান। কর্মসূচিগুলোর মধ্যে থাকছে না সত্যিকার অর্থে জনকল্যাণের গভীর ছোঁয়া। তাই এ অবস্থায় সাক্ষরতার বিস্তার, সাক্ষরতাকে শিক্ষায় রূপ দেয়া এবং এভাবে সঠিক উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ অবস্থার অবশ্যই পরিবর্তন প্রয়োজন এবং তা এখনই। একটি সত্যিকার অর্থে উন্নত এবং গর্বিত জাতি গঠনের জন্যেই তা অনিবার্য।

মীর মাসরুর জামান ঃ ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, লেখক, সাংস্কৃতিক কর্মী।